Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 79 – 86
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কবিসত্তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ : শঙ্খ ঘোষ

আরিফা সুলতানা
প্রভাষক, বাংলা
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনেলোজি, কাদিরাবাদ, নাটোর
ইমেইল : shilpoarifa2010@gmail.com

Keyword
কবি, কবিতা, যাপন, অভিজ্ঞতা, অন্তর্সত্তা, নির্যাস, সমাজসত্তা, বহির্সত্তা।

Abstract
আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২ - ২০২১) এক অনন্য প্রতিভাধর কবি। তাঁর সৃষ্টিশীল কবিসত্তার অন্তরালে এক প্রখর দায়বোধ নিভৃতে বহমান থাকে। ছয়ের দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল পারিপার্শ্বিকতায় বাংলা কবিতার বিষয় এবং শৈলির যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয় সেখানে সমকালীন কবিদের উন্মূল, হতাশাগ্রস্ত, বিবমিষার জগতকেই প্রত্যক্ষ হতে দেখা গেলেও কবিতার এক অন্তঃশীল ধীর স্তিতধি যাত্রা দৃশ্যমান হয় কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যচেতনায়। কবি যেন কাব্য আদর্শের এক অলীক মূল্যবান দায়বোধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে সমকালের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে দগ্ধ হওয়া কবিসত্তার একান্ত সঙ্গী যে চেতন জগত তাকে তিনি পরিশীলিত করে নিলেন এক প্রকার অঙ্গীকারের সূত্রে। ফলে তাঁর কাব্যস্বরের নির্মিতির মধ্যে এক অন্তর্সত্তার সঙ্গে বহিঃসত্তার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। যেটি তাঁকে বাংলা কবিতার এক অনন্য সংবেদনশীল এবং স্পষ্টভাষী কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে কবি শঙ্খ ঘোষের এই বিপুল বিস্তৃত কাব্যজগৎ নির্মাণ কৌশল অন্তর্শীল জগত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে এবং তাঁর কাব্যভাষা কেমন করে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ নির্মাণ করে তা অনুধাবন করা যাবে।

Discussion
শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২২) আধুনিক বাংলা কবিতার একজন সংবেদনশীল কবি। 'কালের ধারায়' পাঁচের দশকে বিদ্যমান বাংলা কবিতার বহুমাত্রিক বিবর্তন ও বিকাশে কবি হিসেবে শঙ্খ ঘোষ তাঁর আত্মাভিজ্ঞান প্রসূত কাব্যভাষা নির্মিতিতে স্বকীয়তার পরিচয় দেন। শঙ্খ ঘোষের কবিসত্তায় আন্দোলিত হওয়া 'নিভৃতযাপন' চিহ্নিত করেছে সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির বিবিধ প্রত্যয়। একজন সচেতন সমাজমনস্ক মানুষের আত্মপ্রকাশের কাব্যভাষা তাঁর লেখনির মধ্য দিয়ে কোন ভাষ্য নির্মাণ করবে তা তাঁর জ্ঞাত ছিলো। কবিতায় তাই তিনি সমকালীন অন্যান্য কবিদের মতো কেবল আত্মসত্তার হাহাকার তুলে আনেননি, বরং সমাজসত্তার বহিরঙ্গকে তুলে এনেছেন। সত্তায় জমে থাকা যন্ত্রণাকে তিনি কাব্যভাষার

মধ্য দিয়ে যাপন করেছেন। তার সেই যাপিত বাস্তবতা; সমাজের নির্মম পাশবিকতার প্রতিভাসে; তার কবিতার শরীর হয়ে ওঠে প্রতিবাদী বাণীভাষ্য। যা কিছু তাঁর অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট, তার সবকিছুই শঙ্খ ঘোষ কবিতায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। লুকাতে চাননি সত্তার অর্ন্তগত কোনো ক্ষুদ্র ভাবকেও। নিঃশব্দের তর্জনী প্রবন্ধগ্রন্থের 'কবিতার তুমি' নামক প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ কবিসত্তার এই আন্তঃসম্পর্ককে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন –

> "আমাদের অস্তিত্ব এমনিতেই ভিতর থেকে নানাখান হয়ে আছে এবং তার একটা দিক বাইরে মুখ ফেরানো, অন্য দিক ধরা আছে কেন্দ্রে। এ দুয়ের মধ্যে সর্বায়ত সংগতি যতই ছিন্ন হতে থাকে, কবিতা হয়ে ওঠে ততোই বেদনারক্তিম, ততই টান-টান চেতনা ধরা পড়তে থাকে এই দুই বিপরীতের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।"[১]

শঙ্খ ঘোষের কবিসত্তার অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ এমনি দোলাচলতায় সক্রিয়। ব্যক্তিচৈতন্যের দায় কবিকে একান্তে পীড়িত করে সমাজে বিদ্যমান সামষ্টিক বিশৃঙ্খলার অপঘাতে। কিছুতেই তিনি বাস্তব প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার তিক্ততা থেকে মুখ ফেরাতে পারেন না। কবিতা হয় তাঁর বেদনা নিঃসরণের মাধ্যম। কবিতাকে অনুভূতির অন্তরঙ্গ মেনে নিয়ে তিনি, কবিতাকেই পরিণত করেছেন জীবনাভিজ্ঞতার বিচিত্র বৈপিরত্য প্রকাশের আশ্রয় হিসেবে। তাঁর কাব্যস্বর হয়ে ওঠে সত্তার নিভৃতে একাকী যাপনের হাহাকার এবং একই সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যম। সৃজনশীল শিল্পী; ব্যক্তিগত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হতাশা-বেদনাকে কবিতার শরীরে কীভাবে প্রতিস্থাপিত করে বয়ন করেন তাঁরই আত্মহননের নামলিপি, শঙ্খ ঘোষের কবিতার শব্দচয়ন আর নির্যাস যেনো প্রতিনিয়ত তারই গুঞ্জনে ধ্বনিত। সমাজ পারিপার্শ্বের বিচিত্র অভিঘাত সংবেদনশীল কবি মনে যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে এবং বিচ্ছিন্নতা কীভাবে একজন কবিকে দাঁড় করিয়ে দেয় আত্মমুখী একাকিত্বে তার এক ব্যতিক্রমী ভাষ্য প্রকাশিত হয় শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। গণতন্ত্র ও সামাজিক সুশাসনের অন্তরালে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিকভাবে ক্ষমতা এবং পুঁজির মাত্রাতিরিক্ত নেতিবাদী বিকাশ মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। শঙ্খ ঘোষের কবিতার অন্তরাত্মায় সমাজধ্বসের এই নিশ্চুপ প্রবাহ ভাষিকরূপ পায়। আর্তমানবতার পরিচিত আর্তনাদ শব্দের জাল বেয়ে তাঁর কবিসত্তায় তৈরি করে বিচিত্র প্যারাডক্স। আত্মহননের নায়ক বনে কবি নিজেকেই যেনো তাই নিমজ্জন করতে চান বেদনার অন্ধগহ্বরে। কবিতায় প্রকাশিত কবির 'তুমি' এবং 'আমির' রূপকল্প প্রতিনিয়ত তাড়িত করে কবিঅস্তিত্বকে। শঙ্খ ঘোষ বলেন –

> "খানিকটা নিষ্ঠুর শোনালেও কথাটা সত্যি যে, অনেকসময়ই কবি কথা বলেন নিজের সঙ্গে নিজে। তাঁর একটা অস্তিত্ব অপর অস্তিত্বকে প্রশ্ন করে, বিদ্রুপ করে, আঘাত করে, প্রীতি করে। এই দুইয়ের মধ্যে যাওয়া-আসাতেই কবি প্রতিমুহূর্তে অর্জন করে নিচ্ছেন এক তৃতীয় সত্তা।"[২]

এই সীমাহীন অস্তিত্বই নির্ধারণ করে কবির দায়বদ্ধতা। আমিত্বকে কবিতায় গেঁথে তিনি পরখ করে নেন। কখনো চোখ মেলে আলো দেখবে এমন শুভ্রতার কোনো আশ্বাস পাওয়া যায় না তাঁর কবিসত্তায়। অন্ধকারের আর্তকণ্ঠে কবি সেখানে রক্তিম হয়ে থাকতে চান। আবার কবিতায় ধ্বনিত হচ্ছে সমাজ-রাজনীতির অসঙ্গতির স্পষ্ট অবয়ব। সচেতন শিল্পীর সংবেদন নিয়ে তিনি সৃজন করছেন পরিপার্শ্ব। আর তাঁর কাব্যভাষা সর্বদাই বিনয়ী। কোথাও যেন কোনো ছন্দপতন নেই, নেই কোনো মাত্রাতিরিক্ততা। তাঁর কবিতায় কোনো দাম্ভিক স্বর নেই। এই অতলে বয়ে যাওয়া নিঃশব্দ নির্জনতা নিরন্তর প্রকাশ করে চলে তাঁর শিল্পীদায়। কবিতাকে তিনি কেবল বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম করেন না। তাঁর কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের দ্বৈতসত্তায় ধ্বনিত হয় চেতনাকথা। কবিচৈতন্যের আত্মঘাতি আয়না শব্দের ফ্রেমে বন্দী হয়ে প্রকাশ করে কবির আত্মকথন; যা হয়ে যায় সমাজভাষ্যেরই নামান্তর। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় এভাবেই উন্মীলিত হয় কাব্যভাষা। শব্দের জালে মানুষকে বাঁধতে চেয়েছেন তিনি। তাই তাঁর কবিতায় শব্দের চেয়ে যেনো নিঃশব্দতা বেশি ঝঙ্কৃত হয়। কবিতার জন্য কবিতা নয় বরং কবিতাকেই তিনি স্বয়ম্ভু সত্তা মেনেছেন। যে কবিতা স্বয়ম্ভু সৃষ্টি হয়ে পাঠকের সাথে একাত্ম হয়। যে কবিতায় পাঠক খুঁজে পায় তার আত্মছবি। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের কবিতায় সমাজ পরিবর্তনের, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার, আত্মন্মোচনের যে স্বর চিৎকারে বা অশ্লীলতায় রূপ নিয়েছে, তিনি যেনো সচেতনভাবে কাব্যভাষা থেকে সেই চিৎকার, দাবিকে প্রত্যাহার করেছেন। তাঁর সমকালীন যুগ চেতনায় তিনি সমাজের সাথে নিজেকে একাত্ম করে যে স্বতন্ত্র কাব্যভাষা, শব্দসাম্য নির্মাণ করেছেন তাই তাঁকে বাংলা কবিতার ইতিহাসে করেছে ভিন্ন স্বরের ভাষ্যকার।

নিভৃতে, একান্ত অন্তরালেই শঙ্খ ঘোষ রচনা করেছেন হতাশার ভাষ্য, বেদনার শীর্ণ গাঁথা আবার প্রতিবাদের স্বর। প্রেমের পঙ্কিল বা শুভ্র বীভৎসতাও তাঁর স্বীয় সৃষ্টি। রোমান্টিকতার অপার বিস্ময় নিয়ে তাঁর কবিতা বিচরণ করেছে অর্ন্তলোকে এবং বহিরাঙ্গনে। হৃদয় স্পর্শ করা আরক্তিম ভালোবাসার চিরকালীন শুভ্রতা ধরা অধরায় বয়ে চলে তাঁর কবিতার ভাষায়। তাঁর প্রথম কাব্য *দিনগুলি রাতগুলি* (১৯৫৬) তে এই স্বকীয়তা প্রগাঢ়ভাবে স্পষ্ট হয়েছে। এ কাব্যের প্রতিটি কবিতাই তাঁর অস্তিত্বের জানান দেয় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। শঙ্খ ঘোষ এ কাব্যে একে একে উন্মোচন করেছেন সভ্যতার দাবদাহ, নগরীর বীভৎসতা।

> "প্রথম কাব্য থেকেই তাঁর কবিতায় বিষাদের যে হাল্কা আস্তরণ লেগেছে তা রয়ে গেছে শেষমেষ। বিদ্রোহ নেই, বিক্ষোভ রয়েছে, তাও চাপা। তাঁর হৃদয় যন্ত্রণায় কেঁদে কেঁদে উঠেছে প্রকৃতির নিদারূণ প্রতিকূলতায়, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট দুঃখী মানুষের বেদনায়।"[৩]

কবির অন্তরাত্মার দহন, ক্ষয় তৈরি হয় পারিপার্শ্বিক সমাজের অবক্ষয়ের কারণে। ফলে সমাজ পরিবর্তনের চেতনা, মূল্যবোধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। "যমুনাবতী" কবিতাটিতে একই সাথে কবির যুগ্মসত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একদিকে বিশৃঙ্খল সমাজবাস্তবতায় নিরন্ন মানুষের ক্লিষ্টতা অপরদিকে সমাজের মূক পাপাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তেজস্বীতা বাণিভাষ্য পায় এখানে। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের দুরবস্থা, শৃঙ্খলিত জীবনের দুর্বিসহ চিত্র শঙ্খ ঘোষের কবিসত্তায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

> "সদ্য থেমেছে মন্বন্তরের মারণ-উৎসব, সবার ঘরে তখনো প্রচুর অন্ন নেই/ ঘরে ঘরে চলছে অরন্ধনের অসহায়তার ক্ষেদোৎসব।"[৪]

যমুনাবতীকে মাধ্যম করে কবি ব্যক্ত করেছেন ভারতবর্ষের সমস্ত নিরন্ন মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থান। ব্যাক্ত করেছেন, তাদের উপর শোষকশ্রেণির পীড়ন কেমন প্রকৃতির। একইসঙ্গে তিনি পথ তৈরি করেন এই দলিত শ্রেণির মুক্তির। ফলে কবিতা মাধ্যম হয়ে ওঠে শোষিতের প্রতিবাদের শক্তি প্রকাশের। যা তিনি তাঁর আত্মসত্তায় আবিষ্কার করেছেন এবং তা সামাজিক বিকাশের মুখপত্র করেছেন। ফলে দেখা যায় তার কবিতার ছন্দে যে সুর খেলা করে, তা একপ্রকার গুমোট পরিবেশকে প্রতিস্থাপিত করে, যেটা মূলত সামাজিক বাস্তবতা। প্রতিবাদ যে কাব্যস্বর উপস্থিত করে তা হয় সমাজ পরিবর্তনের এক অভিনব ডাক। কবির ভাষায়

> "নিভন্ত এই চুল্লিতে মা/ একটু আগুন দে/ আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি/ বাঁচার আনন্দে!"[৫]

ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনামল বা তার পূর্ববর্তী সময় থেকে মানুষ বাঁচার সহজাত আনন্দ হারিয়েছে। নিম্নশ্রেণির দলিতরা এই ভূখন্ডে ঐতিহাসিকভাবে বর্ণপ্রথার শিকার হয়েছে, ভূমিদাস প্রথার শিকার হয়েছে। বহুপূর্ব থেকেই তারা শ্রেণিবৈষম্যের বলি হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে ক্ষমতার রদবদল সাধারণ মানুষের জীবনব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। সহজাত 'বাঁচার আনন্দ' তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তি সাধারণের জীবনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। বরং তারাই মন্বন্তরের কবলে, দাঙ্গার নির্মমতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কবির ভাষায় 'দু-পারে দুই রুই কাৎলার/ মারণী ফন্দি'[৬] তে তাঁরা আবদ্ধ। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন কবির প্রত্যাশা। তাই পুঁজিবাদী সভ্যতার এই শক্তজাল ছিন্ন করতে কবি 'যমুনাবতীর' নরম হাতকেই 'হাতিয়ার' হিসেবে তুলে ধরত চান। কারণ একমাত্র প্রতিবাদী যমুনাবতীরাই পারে হাজারো নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধি হতে। তারা মৃত্যুকেও পরোয়া করে না। তাদের 'হাড়ের শিরায় শিখার মাতন/ মরার আনন্দে![৭] কবির প্রত্যাশা এদের তৈরি করবে একটি ত্যাগী 'মারূপী দেশমাতৃকা'। যারা জানে যমরূপী স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার 'ধার চকচকে থাবায়'[৮] যমুনাবতীদের প্রতিবাদী সত্তা রক্তবাসরে লীন হবে। কিন্তু পরিবর্তনের অগ্রসৈনিক কন্যাদের এই অগ্নিযাত্রা মায়ের বুকে, ধমনীতে কান্নার ঢেউ তুললেও তারা পিছপা হবে না। 'মায়ের কান্নায় মেয়ের উষ্ণ হাহাকার মরে না –

> "চলল মেয়ে চলল।/ পেশির দৃঢ় ব্যাথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা/ চলল মেয়ে রণে চলল।"[৯]

শঙ্খ ঘোষের অন্তরাত্মার ধিকিধিকি আগুন যমুনাবতীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রক্তে প্রবাহিত হয়ে সাধারণের মধ্যে সঞ্চালিত করে শোষকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী হয়ে উঠতে। সাধারণ, নিম্নবিত্ত, বঞ্চিত শ্রেণিকে এই কবিতা সমাজের উপরি

কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়। কারণ 'যমুনাবতী' মূলত স্বদেশেরই ইতিবাচক শক্তির প্রতিরূপ। শঙ্খ ঘোষ কৌশলে ভারতবর্ষের সকল সাধারণের মাঝে প্রতিবাদের বীজ বুঁনে দেন এ কবিতার মাধ্যমে। 'যমুনাবতী স্বরস্বতী' বলে কবি দেখাতে সক্ষম হন –

> "যমুনাবতী স্বরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে/ যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে/ বিষের টোপর নিয়ে।/ যমুনাবতী স্বরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে/ দিয়েছে পথ, গিয়ে।"[১০]

যে যমুনার বিয়ে, যার কথা ছিলো সুখের বাসর রচনা করার, সে যমুনা যেনো অসংখ্য যমুনার প্রতিনিধি হয়ে রণে যাত্রা করে, নেকড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়। বাসর রচনা করে বুকে বারুদ নিয়ে, বিষের টোপর নিয়ে। শঙ্খ ঘোষের পরিশীলিত কল্পশক্তি, মতাদর্শিক অবস্থান একজন ত্রানকর্তার রূপ দেয় 'যমুনার অবয়বে'। যে যমুনা জাতির হাল ধরবে, পুঁজিবাদী ক্ষমতা বলয়ের ক্ষমতাসীনদের অন্যায়, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দেবে, বঞ্চিতদের প্রতিনিধি হবে। কবি শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যয়ে এ কবিতার সমাপ্তি টেনেছেন। 'নিভন্ত চুল্লিরূপী' অগণিত মানুষের আত্মার ভীরুতা, প্রতিবাদ অক্ষমতায় এবার যেনো সত্যি আগুন ফলেছে।

পাঁচের দশকের শেষার্ধে এবং ছয়ের দশকের শুরুতে আমেরিকার 'বিট' কবিদের সান্নিধ্যে এসে 'হাংরি জেনারেশন' বা ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায় নামে যে কাব্য আন্দোলন ভারতীয় কবিদের মননে নতুন প্রত্যয় ঘনীভূত হয় শঙ্খ ঘোষের কবিতাচর্চায় সেই ভাবধারা বিদ্যমান। হাংরি জেনারেশনের কবিদের মূল সুরে পরিণত হয় নিয়ম ভাঙার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আপাত সুখী, সুশ্রী জীবনকাঠামোর অন্তরালে সভ্যতার যে আরো নোংরা বীভৎস রূপ আছে তা তাদেরকে অস্তিত্বের মর্মরূপ সন্ধানী করে তোলে। শঙ্খ ঘোষের কবিতায়ও নিয়ম ভাঙ্গার এই ধ্বনি উচ্চকিত। শঙ্খ ঘোষের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, তিনি প্রথাবদ্ধ সংযম, সামাজিক অনৈকতার বিরুদ্ধে গিয়ে অস্তিত্বের অনুসন্ধান করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু তার কাব্যভাষা উগ্র এবং অশ্লীল হয়নি কখনো। হাংরি আন্দোলনের প্রবক্তা মলয় রায় চৌধুরি বলেন;

> "কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। কারণ, কবিতার মাধ্যমে জীবনের অর্থ অন্বেষণের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন কবিতার প্রয়োজন অনর্থ ঘটানোর জন্য। কবিতা ব্যক্ত করবে মানবিক, দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধার কথা। মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত, কবিতা এখন মানুষের শেষ আশ্রয়।"[১১]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা মানবিক ক্ষুধার কথা ব্যক্ত করে, দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধাকে ব্যক্ত করে তবে হাংরির অন্যান্য কবিদের মতো তা যৌনতাসর্বস্ব, দেহগন্ধী আর চমকসৃষ্টির কাব্যপ্রয়াস হয়ে ওঠেনি। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মননশীলতার এবং সৃজনশীলতার যৌথ সম্মিলনে তৈরি হয় এক ভিন্ন স্বর, ভিন্ন উজ্জীবন। একজন বিবেকবান, সমাজসচেতন শিল্পী হয়ে তিনি কাব্যে প্রকাশ করেন তাঁর দৈন্য। তাঁর সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নের যাবতীয় অপারঙ্গমতা। একজন শুভ্র শিল্পীর দায়, ব্যর্থতা কীভাবে তাঁকে অসহায় করে তোলে আর অসহায়ত্ব নিয়ে তিনি প্রকৃতির কাছে, আত্মসত্তার কাছে কী চান তা ধ্বনিত হয় তার কাব্যস্বরে। 'কবর' কবিতাটিতে সমাজ বদলের স্বপ্ন স্বাধীনতার অঙ্কুরেই কীভাবে নতুন করে ব্যর্থতায় ভরে উঠলো, সাম্যবাদী স্বপ্নে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের অন্তিম পরিণতি যেভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হলো তার এক শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা উঠে আসে। কবির অবচেতন সত্তার অহম যেনো সমাজের এই আত্মঘাতি চেহারার সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে চলতে পারে না। কবিতার ভাঁজে ভাঁজে ধ্বনিত হয় সমাজে মানুষের মানবিক অস্তিত্ব লীন হওয়ার যন্ত্রনা। এ যন্ত্রণার লজ্জা যেনো কবিকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়, কবি বেঁচে থাকতে পারেন না তাঁর সচেতন সত্তার দহনে। কবির ভাষায় :

> "আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
> লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে -
> গোপন রক্ত যা- কিছুটুক আছে আমার শরীরে,
> তার সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।"[১২]

শস্য ফলানোর জন্য কবির নিভৃত বাসনার অবশিষ্ট ইচ্ছাকেও তিনি মানুষের মাঝে দিতে চান। শস্যরূপী শুভ, কল্যাণ, বৈষম্য দূর করার স্বপ্ন ব্যর্থ হলে যে বিকট হতাশা তাঁকে আঁকড়ে ধরে তা থেকে কোনো নিস্তার নেই কবির। কিন্তু কেনো? কারণ –

> "রক্তভরা বীভৎসতায় ভরেছে তার শীর্ণ মাটি/ রিক্ত শুধু আমাদের এই গা-টা/ টানা টানা চক্ষু ছিঁড়ে উপচে পড়ে শুকনো কাঁদা/ থামল না আর মরুবালার হাঁটা!"[১৩]

রক্তভরা বীভৎসতায় বাংলার মাটিও শীর্ণ, শূণ্যতায় কবির উপলব্ধিতে বারবার হানা দেয় 'টানাটানা চোখ ছিঁড়ে কাঁদার উপচে পড়া দৃশ্য'। অগুণতি মানুষের দেশত্যাগ। দাঙ্গার বীভৎসতায় লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের উদ্বাস্তু পদযাত্রা। গৃহহীন, সহায়হীন মানুষের পদশব্দ, উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন এ যাত্রা শঙ্খ ঘোষের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে 'মরুবালার হাঁটা হয়ে'। পৃথিবীকে তাঁর মনে হচ্ছে 'ঋজু কঠিন' যেন এ পৃথিবীর সমস্ত অক্ষমতা ধরা দিয়েছে 'কবির চোখের পলে'। অমানুষে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে কবির মনে হতে থাকে, যেন সত্যিই তিনি রয়ে গেছেন 'বীর্যহারার দলে' যাদের দ্বারা রচিত কোনো মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী পরিবর্তনের আর কোনো কাজে আসবে না। ফলে কবির শেষ আর্তি কবরেই ঠাঁই করে নেওয়া। তাঁর ভাষায় –

> "মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে/ অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।"[১৪]

প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে যদি কোনোদিন যজ্ঞ হয়, মানুষ যদি ধ্যানী, জ্ঞানী, নৈতিক, শোষকহীন, বিবেকবান 'মানুষে' পরিণত হয়ে আগামীর জন্য একটি সুন্দর সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তবে সেইদিন যেনো কবির হাড়েই অস্ত্র গড়া হয়, এই তাঁর প্রত্যাশা। এভাবেই শঙ্খ ঘোষ কবিতার বাঙ্ময়তার মাধ্যমে মানুষের কাছাকাছি থেকে, সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে চান। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন –

> "শঙ্খ ঘোষের কবিতা যে সচেতনতায় বিশিষ্ট, তা কোনো আরোপিত সচেতনতা নয়, তা নয় মাত্র সংবেদী সচেতনতা, অবগাঢ় অথচ অবহিত এক চলিষ্ণু সত্তা যা কিছু অর্জন করেছে দুঃখে অথবা ক্রোধে, তিক্ততায় অথবা মাধুর্যে, এ কবিতাগুলি সেই অর্জিত ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফল। এই ক্রমবর্ধমান বা nascent বিশেষণটি, মনে করি, একজন যথার্থ কবির পক্ষে সব থেকে নির্ভুল অভিজ্ঞান।"[১৫]

শঙ্খ ঘোষ সচেতনভাবে তাঁর কবিতার অন্তরঙ্গে এবং বহিরঙ্গে যে দার্শনিক প্রত্যয় নির্মাণ করেন তা অন্যন্যতা পায়। কবিতার দর্শন তাঁকে মানবিক কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ বলেন –

> "কবিতা হল তাই যার মধ্যে দিয়ে আমাদের বেঁচে থাকাকে গভীরতম আর ব্যাপকভাবে ছুঁয়ে থাকতে পারি আমরা। কবিতা হলো তাই যা আমাদের অধিচেতনা আর অবচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় সময় চেতনাকে।"[১৬]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা এই চেতনতেই ভাস্বর। তাঁর কবিতায় আছে সময়কালের যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণা তাঁকে ঠেলে দেয় অন্ধকারের অতলে। কবিতায় ফুটে ওঠে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ঔদাসীন্যের হাহাস্বর। তাই তাঁর 'কবিতার জগত' আর 'বাঁচার জগত' একাকার হয়ে যায়। আনন্দ বিষাদ যাই হোক সবখানেই পড়ে 'জীবনের অন্ধগলির ছাপ'। কবির একান্ত সত্তা আর সামাজিক সত্তা লীন হয়ে মিশে যায় একে অন্যের সঙ্গে। তিনি কবিতার ভিতর সমর্পিত হন জীবনের সবটুকু খেদ নিয়ে। তিনি প্রেম, প্রিয়া, আত্মশক্তির উজ্জীবন, হতাশা, দৈন্য সব একাকার হয়ে সমর্পিত হন কবিতারই কাছে। কবির ভাষায় –

> "হে আমার তমস্বিনী মর্মরিত রাত্রিময় মালা, / মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার/ উদাসীন মালা/ আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে/ দুপুরে বিকেলে/ এবং আমাকে বলো, মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন/ আমি হবো তাই/ তৃণময় শান্তি হবো আমি।"[১৭]

নগরজীবনের ক্ষয়, স্বার্থপরতা, ঝলমলে সভ্যতার অন্তরালে আরেক সভ্যতা, যে নগরজীবনের সভ্যতা দুটি পৃথক শ্রেণির মানুষকে দিয়েছে দুই পৃথক জীবনযাপন- এই মানবিক সংকট কবির কাছে দুঃসহনীয় হয়ে ওঠে। কবিতার নির্মল অথচ আর্তশব্দে তা তৈরি করে কবির অন্তসত্তার সঙ্গে বহিঃসত্তার এক দ্বৈত প্যারাডক্স। 'অসংখ্য মৃত্যুফুলে সভ্যসমাজ পরাজিত', অন্ধ আপাত সভ্য নগরজীবনের অন্তরালে কবি দেখেন 'আত্মার মৃত্যু', 'শরীরী মৃত্যুর স্তূপ'। ফলে নিঃসঙ্গ কবির অন্তর্লোক বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। আলোর সন্ধানে ব্যর্থ কবি বারবার রাত্রির অন্ধকারেই সঁপে দেয় নিজেকে, কবিতার শরীরে। তিনি কবিতায় বলেন –

> "হে আমার সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো

ঐ তার আরুলায়িত বেদনার কালো, তারই চুপে দীর্ঘকাল এ আমার স্নান,
বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা-"[১৮]

কবির এই চেতনার মধ্য দিয়ে যেন ভেসে ওঠে ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের (১৮২২-৬৭) মানসঅভিজ্ঞান জাত দর্শন। বোদলেয়ারের মতে,

> "আপাত-দৃষ্টিতে জটিল মনে হ'লেও সৃষ্টি এক ও অখন্ড, বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতা মানবসত্তার দুই প্রকাশ। সেই জন্য বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।... একদিকে আধ্যাত্মিক পরমানন্দ, অন্যদিকে হতাশা, জুগুপ্সা, বেদনা...।"[১৯]

শঙ্খ ঘোষের মনস্তাত্ত্বিক জগতও যেন এই সূত্রে বাঁধা পড়ে। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) যেমন বোদলেয়ারের আত্মপীড়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান -

> "দানবীয় প্যারিস নগরীর মধ্যে নিঃসীম নিঃসঙ্গতার ভার যে কী দুর্বিসহ এবং তাকে ভোলবার জন্যে কী মর্মন্তুদ চেষ্টা কবির, তা *Les Fleurs du Mal* এর প্রতি চরণে পরিস্ফুট।"[২০]

সমাজ-সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে কবি শঙ্খ ঘোষের সত্তাগত তাড়নাও একই যন্ত্রণায় দগ্ধ। তবে তিনি কেবল নেতিতেই বাঁচতে চাননি। আর এখানেই কবি হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তিনি অন্ধ গহ্বরে ইতির নির্যাসও দেন একই সুরে। কবিতা তাই তাঁর কাছে হয়ে ওঠে 'মিতা'। তিনি কবিতাকে পরম প্রিয় করে তোলেন বিনয়ের সঙ্গে। তিনি কবিতাকে গ্রহণ করেন 'মিতা, প্রিয় থেকে প্রিয় সখী সুহৃদ সুন্দর'[২১] বলে। হঠাৎ এক ইতিবাদী উচ্ছ্বাসে নতুন চেতনার আলো এসে ভিড় করে কবিতা তাঁর সমস্ত মনন জুড়ে। রাবীন্দ্রিক রোমান্টাকিতার স্বর দৃশ্যমান হয় কবিমননে। কবির ভাষায় -

> "জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারই বিকাশ/ মেঘের গুহায় ঢালি হৃদয় হৃদয় যখন, দেখি তোমারই বিকাশ/ কুয়াশা উথাল জটা দিক দিক ভরে যদি, তোমারই বিকাশ/ স্মরণ যেখানে, প্রাণ যেখানেই, সেখানেই তোমার বিকাশ।"[২২]

সমকালীন পারিপার্শ্বিকতায় - সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উৎপীড়নের তান্ডব দেখে অন্যান্য কবিরা কবিতার মধ্য দিয়ে কেবল নেতিকেই প্রকাশ করেছে। স্বদেশের জন্মান্ধ অবস্থাকে অধিকাংশ কবিরা অশ্লীলতায় মুড়িয়ে কাব্যভাষায় নেতির পূজা করেছেন। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ সেই নেতিকে উপলব্ধি করেও এক প্রচন্ড আশাবাদী সত্তা নিভৃতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর কাব্যভাষার শুভবোধের বর্ণনা ইতিবাচকতার উপলব্ধিতেও পূর্ণ। তিনি সমাজের জড়ত্ব ভাঙার গান গেয়ে যান উদ্বেলিত কণ্ঠে। কবির উপর, নিজের উপর ন্যাস্ত করেন সমাজ পরিবর্তনের ভার।

> "কবি রে, তোর শূন্য হাতে/ আকাশ হবে পূর্ণ-/ উদাস পাখির গভীর সুরে/ ডাক দে তারে ডাক দে। ভাঙতে কাঁকন, ছিঁড়তে বাঁধন/ কুলোয় না তার সাধ্যে/ কবি রে আজ প্রেমের মালায়/ ঢেকে নে তোর দৈন্য!"[২৩]

শঙ্খ ঘোষের কবিসত্তা সম্পর্কে জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর আধুনিক কবিতার মানচিত্র গ্রন্থে বলেন –

> "শঙ্খ ঘোষ পঞ্চাশের দশকের কবি। যে কথা তিনি বলেন, তা যে সবসময়ই নতুন কথা এমন নয়। কিন্তু পুরনো কথাকেও তিনি এমন তালে এমন ভঙ্গিতে বাজিয়ে নেন যাতে তা নতুন কালের নতুন কথা হয়ে ওঠে।"[২৪]

এভাবেই যেন তাঁর কবিসত্তার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ সমকালীনতাকে ছুঁয়ে চিরকালীন কবিতার দায় মিটিয়ে চলে। তাঁর কাব্যস্বরের প্রাসঙ্গিকতা ফুরোয় না। কবিতার দায়বদ্ধ সত্তা তার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। নিষ্পাপ, আবেগী এক কণ্ঠে শঙ্খ ঘোষ কবির সকল নিঃসঙ্গতার দৈন্য ঢেকে দিতে চান। প্রেম দিয়ে, বিনয় দিয়ে জয় করতে চান তাঁর প্রেমকে আর সমস্ত শৃঙ্খলাকে। 'কবির বর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে কবিসত্তার অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর-

> "বিনয়ের মধ্যেও একটা সামর্থ থাকতে পারে, থাকতে পারে আত্মপ্রত্যয়ের এই সম্ভবনাময় বীজ, বিপুল এই ঘোষণা যে, 'দেখো এই হচ্ছি আমি। এইটুকুই, এর চেয়ে বেশি নয়, কমও নয় এর চেয়ে। আর তারপর কে আমার কী বিচার দিল, সে শুধু তার দায়। সে বিচারে আমার আমিত্বের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।' গর্বিত এই বিনয়ের ঘোষণাই যে কোনো কবির বর্ম। ...প্রত্যেক কবি স্বতন্ত্র

থেকেও তখন সবাই মিলে গড়ে ওঠে একটা আনন্দময় দল, পরস্পরের মমতামাখানো বহুবিচিত্রের এক উদ্দীপক জীবনসংঘ।"[২৫]

শঙ্খ ঘোষ আধুনিক কবিতার মানচিত্রে তাঁর চেতনাগত অবস্থান, কবিতার অর্ন্তঘাতের মধ্য দিয়ে এভাবেই বাঁচিয়ে রাখেন। বেদনা, হতাশা, ক্লেদ যে সামাজিক- রাজনৈতিক দমনের কারণে অন্তর্জগতকে দ্বিখন্ডিত করে এই অনুধাবনই তাঁকে তা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা দেয়। ফলে অবক্ষয়বাদীদের মতো আত্মসত্তার চাপ তাকে আড়ষ্ট করলেও তিনি জনসমুদ্রে ফিরে আসেন ইতিবাচকতার প্রতীক হয়ে। 'বাউল' কবিতায় তাঁর এই প্রত্যয় ব্যক্ত হয় স্পষ্টভাবে। তিনি দেখান অতৃপ্তির দ্বৈত খেলা। যেখানে অতৃপ্তিতে কবি উদাসীন না হওয়ার কথা বলেন -

"বুঝতে পারি তোমার বুকে অন্য কিছু আছে।"[২৬]

কারণ এই অতৃপ্তিকে 'দূর হাওয়াতে ছড়িয়ে দিয়ে 'বুকের অন্ধকারে সুখ বাজিয়ে' দিতে চান তিনি। আত্মশক্তিকে দৃঢ় করার এই ভাববাদী দর্শনের প্রতি তাঁর আনুকুল্য। শঙ্খ ঘোষের কবিতা তাই ভালোবাসার আত্মিক ছোঁয়ায় লীন হয়ে থাকে। ফলে শরীরী প্রকাশ থেকে রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতাও তাঁর যাত্রা অব্যাহত থাকে।: কবির ব্যক্তিগত সংসার জীবনের খুটিনাটি আবহ উঠে আসে কাব্যভাষায়। কবির ভাষায় –

"ইচ্ছে হল ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর
'এ যে বিষম! এ যে কঠিন!'
কী যে ছোট্ট বাড়ি-
সকালও তার মুখ দেখে না, বিকেল করে আড়ি।"[২৭]

যে বাড়ির মুখ সকাল বা বিকেলের দেখা পায় না অর্থাৎ আলো যে ছোট্ট বাড়িতে পৌঁছায় না, সে বাড়িতে কবির প্রিয়ার বসবাস। অথচ ভালোবাসার অন্ত নেই সেখানে। জ্বর হয়েছে খুকুর অথচ কবিপ্রিয়া কিছুতেই কবিকে ঘরে ঢুকতে দিল না বরং কেঁদে ফেললো। খুকির জ্বর অথচ কবি যেন উদাস। কিন্তু কবিপ্রিয়ার মনে কোনো বিদ্রোহের ঝঞ্ঝা নেই, আছে বাৎসল্য। আর কবিমনে প্রিয়ার প্রতি একটু ভয়ের আভাস। কবিতার ভাষায়—

"পীতল মুখে শুন্যে ঝোলে সূর্য সারা দুপুর/ ঘরেতে তার তাপ পৌঁছয়, জ্বর হয়েছে খুকুর।/ শুকনো ভাঙা বেদানা তার মাথার কাছে খোলা।"[২৮]

এতো ভাঙা-গড়ার মধ্যে শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিসত্তাকে স্বাতন্ত্র্যের শিখরে উন্নীত করেন শিল্পীত ভঙিমায়। পাশ্চাত্যের বিবিধ পঠনপাঠন পঞ্চাশ- ষাটের বাঙালি মননে যে নরকদুয়ারের সন্ধান দেয় তা কবিরা সহজেই আত্মস্থ করেন। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তান্ডবে ভারতবর্ষের অগণিত সৈন্যের প্রাণহানী, স্বজনহারা মানুষের হাহাকার, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্র রোষ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ক্ষুধা, মাড়ি, মন্বন্তর, হত্যা, লুণ্ঠন, সম্ভ্রমহানির যে বিষাক্ত ভূমিতে বাঙলার মাটি, প্রকৃতি, আর্থসামাজিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা শঙ্খ ঘোষের মননে এক বৈরী মনোভঙ্গির সৃষ্টি করে। এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) পোড়োজমির (১৯২২) সাথে আত্মিকভাবে সূত্র স্থাপন করেন তিনি। সমসাময়িক সকল কবিদের কবিতায় যুগমানসের এই ক্লেদজ পঙ্কিলতা হানা দিয়েছে। তদুপরি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের একঘেয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতায় মাথাচারা দিয়ে ওঠা পুঁজিবাদী সভ্যতা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় যে দাসবৃত্তি লেবেল সেঁটে দিয়ে অন্ধ ফুৎকারে মানবসভ্যতাকে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলিতে নিপতিত করে তার বিরুদ্ধে স্বর তোলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তবে তাঁর সে স্বর আত্মমুখী হয়েও ধারণ করে মানবাত্মার কণ্ঠ। অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবিত হয়ে নতুন চেতনায়- জ্ঞানে, প্রেমে, সাম্যে তাঁর অগ্রযাত্রা শুরু থেকেই নিরন্তর। শঙ্খ ঘোষ কল্পলোকের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান জাতিকে। যে কল্পলোকেই থাকে বাস্তবের স্বর্গ রচনার মন্ত্র। চেতনার পরিবর্তন তাঁর কবিসত্তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে এভাবেই নিত্য ধ্বনিত হতে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৭৪

২. তদেব, পৃ. ৭৫
৩. মিশ্র, অশোক কুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ, ৩৪০
৪. তদেব, পৃ. ৩৩৯
৫. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২০
৬. তদেব, পৃ. ২০
৭. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২০
৮. তদেব, পৃ. ২০
৯. তদেব, পৃ. ২০-২১
১০. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২১
১১. আরেফিন, সাজ্জাদ, সম্পা, নান্দীপাঠ, 'ষাটের কবিতা, স্বতন্ত্র সময়ের শিল্প, জুলফিকার মতিন, সংখ্যা ৫, পৃ. ১৯০
১২. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১৩
১৩. তদেব, পৃ. ১৪
১৪. তদেব, পৃ. ১৪
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা কবিতার কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ. ২৪১
১৬. চক্রবর্তী, বিপ্লব, লোকাভরণ আধুনিক কবিতার শৈলী, কলকাতা, পুস্তক বিপনী, ২০০৬, পৃ. ৪১৪-৪১৫
১৭. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ৯
১৮. তদেব, পৃ. ৯
১৯. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ. ২৬
২০. তদেব, পৃ. ২৬
২১. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১১
২২. তদেব, পৃ. ১১
২৩. তদেব, পৃ. ১১
২৪. রায়, জীবেন্দ সিংহ, আধুনিক কবিতার মানচিত্র, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৯০
২৫. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ২৪১
২৬. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১৩
২৭. তদেব, পৃ. ২১
২৮. তদেব, পৃ. ২১